পঞ্চসায়রের ইতিকথা
অম্বিকাপ্রসাদ সাহা

ভূমিকা

সঙ্কল্প, সততা ও শ্রম থাকলে সামান্য প্রচেষ্টা যে বড় কর্মকাণ্ডে বিস্তৃত হতে পারে সেটা যাদবপুরের দক্ষিণে বাঘাযতীন ও গড়িয়ার মধ্যে রেল-লাইনের পূর্বে পঞ্চসায়র নামে যে সমবায় আবাস-স্থলটি গড়ে উঠেছে তারই দৃষ্টান্ত। অনেকেই এর আনুপূর্বিক ইতিহাস জানেন আবার অনেকে জানেন না, বিশেষ করে এখন যাঁরা তরুণ এবং পঞ্চসায়রের আবাসিক, তাঁদের এটা শুধু ভালো লাগা নয়, কিঞ্চিৎ প্রেরণা যোগাতেও পারে।

কিছু লোকের উদ্যোগে এবং অনেকের সহযোগিতায় পঞ্চসায়র নির্মিত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের কারোর নাম করিনি, কথাসূত্রে কয়েকজনকে উল্লেখ করেছি; তাঁদের অনেকে চিনতে পারবেন। যাঁরা পারবেন না, আশা করি ভবিষ্যতে চিনবেন। এই কর্মযজ্ঞে আমি এঁদের সঙ্গে ছিলাম এই আমার সৌভাগ্য।

অম্বিকাপ্রসাদ সাহা

১১এ, রামানন্দ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

প্রস্তাব

রামায়ণ ইতিহাস কি কাব্য, অযোধ্যা নগরী ছিল কি না, সে সব নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক করুন তবে প্রাচীন ভারতে নগর পরিকল্পনা যে ছিল তারই একটা সুন্দর চিত্র পাই নীচের উদ্ধৃতি থেকে।

"এই সুদৃশ্য মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ, তিন যোজন বিস্তৃত এবং প্রশস্ত মহাপথ ও রাজমার্গে সুবিভক্ত। এই সকল পথ বিকশিত পুষ্পে অলঙ্কৃত এবং নিত্য জলসিক্ত।···এই নগরীতে কপাট ও তোরণ এবং বিপণিসমূহ উপযুক্ত ব্যবধানে স্থাপিত আছে।···এই শ্রীসম্পন্ন অতুলপ্রভাবান্বিত পুরী উচ্চ অট্টালিকা ও ধ্বজাসমূহে শোভিত এবং শত শতঘ্নী দ্বারা সংরক্ষিত। বহু স্থানে পুরনারীদের জন্য নাট্যশালা, উদ্যান ও আম্রবন আছে এবং চতুর্দিক শালবনে বেষ্টিত। দুর্গম পরিখা থাকায় সেখানে অন্যের প্রবেশ দুঃসাধ্য।···

সেখানকার লোকেরা আনন্দিত, ধর্মপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, নিজ নিজ সম্পত্তিতে তুষ্ট, নির্লোভ ও সত্যবাদী ছিল।···এমন লোক ছিল না যে কুণ্ডল মুকুট ও মাল্য ধারণ করে না, যার অঙ্গ সুবাসিত নয় এবং যার ভোগের অভাব আছে।"

এটি রাজশেখর বসু কর্তৃক বাল্মিকী-রামায়ণের সারানুবাদ থেকে অযোধ্যা নগরীর বর্ণনার কিছু অংশ। এরই সঙ্গে Ebenzer Howard-এর The Garden city of To-morrow পড়ার ফলে এবং প্রয়াত ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরীর তিন বৎসরে সৃষ্ট বিরাটির কাছে সমবায়ভিত্তিক 'নবাদর্শ' উপনগরী নির্মাণের দৃষ্টান্তে শহর কলকাতার একটু বাইরে যে আকাশ, জল ও মাটির সান্নিধ্যে থাকা যায়—এইরকম একটা আবেগ মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল।

সেটা ১৯৬৬ সাল। হঠাৎ একদিন ক্যান্টিনে আর একজনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এইরকম একটা উপনগরী গড়লে কি রকম হয় আলোচনা

করতে করতেই ঠিক হয় প্রথমে একটা সমবায় সমিতি করা দরকার। আলোচনা ও কল্পনার উত্তাপ থাকতে থাকতেই কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তখনই দু' টাকা করে নিয়ে দিন পনেরর মধ্যেই সাত শ টাকা উঠে গেল, এক প্রস্তাবিত সমবায় আবাসনের আবেদনে। A. G. West Bengal Employees' Cooperative Housing Society Ltd. নামে এক সমিতি গঠিত হল এবং Bengal Cooperative Societies Act, 1940 অনুসারে Registered No. Cal / 60 of 1966 হিসাবে সহজেই রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল। তখন সমবায় আবাসন সমিতির রেজিস্ট্রেশন খুবই সহজ ছিল।

তারপর সুরু হল জমি খোঁজা। তখন কলকাতায় এবং সহরতলিতে বাসযোগ্য জমির অভাব ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ জমিতেই Land Acquisition Act-এর Section 4-এর Notice ছিল, অর্থাৎ সরকারী প্রকল্পে জমিগুলি অধিকৃত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে, যদিও সেরকম জমি কেনাবেচাও চলছিল, কেননা সরকারী প্রস্তাব এবং সেটা কার্যকর করার মধ্যে ছিল আসমান জমিন ফারাক।

সুতরাং, জমি খোঁজার জন্য সুরু হল ঘোরা। উত্তরে বেলঘরিয়া থেকে দক্ষিণে সুভাষগ্রাম, পশ্চিমে গঙ্গা পেরিয়ে মানকুণ্ডু থেকে শিবপুর, পূর্বে বাঘাযতীন, গড়িয়া পর্যন্ত ছোট বড়, উঁচু, নীচু সব জমিই দেখেছি। পরবর্তীকালে যেখানে সরকারী প্রকল্প কার্যকরী হয়েছে, যেমন গল্ফ ক্লাব রোডে—এখন যেটা গল্ফগ্রীন—সেটাও দেখেছি, সেখানে তখন Calcutta Improvement Trust-এর Notice ছিল। এইসময় কখনও ব্রোকারদের সঙ্গে, কখনও নিজেরাই ক্ষীণ সূত্র ধরে দিনের পর দিন ঘুরেছি। এইরকম বিঘূর্ণিত অবস্থাও আমাদের ক্লান্ত করেনি দুটো কারণে। একটা হচ্ছে সম্ভাবনার আশা আর দ্বিতীয় হচ্ছে, নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, ভাঙা পুকুর পাড়, ফলের বাগান, রাস্তার ধারে চায়ের দোকান—সেখানে নানা চরিত্রের

লোক, এইসব খুব ইন্টারেস্টিং লাগত। একটা জায়গা এত ভাল লেগেছিল যে ভোর বেলা উঠেই এসপ্লানেড এবং সেখান থেকে টালিগঞ্জের ট্রামে প্রথম সিটে জানলার ধারে বসে দ্রুত দীর্ঘযাত্রা আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত, সেখান থেকে পুবের রাস্তায় তখন কয়েকটা পরিচ্ছন্ন বাড়ি, বড় পুকুরটাতে ধোপাদের কাপড় কাচা, তার ওপারে বিস্তৃত বাগান এই সব একটা নতুন আস্বাদ এনে দিত। তখন সহরতলিও ছিল ফাঁকা, যানবাহনেও এত ভিড় ছিল না ; আরো যেতাম ঢাকুরে লেকের ধারে, ভালো করে দেখতাম তার আকৃতি, দীর্ঘ শিরীষ গাছের সারি আর দক্ষিণে রেল লাইনের ওপারে গোবিন্দপুরের বস্তি। এই সবই একটা সুপরিকল্পিত আবাসস্থল গড়ার আবেগকে ঘনীভূত করত। তখন সবে কলকাতার পূর্ব সীমান্ত জুড়ে লবণ হ্রদ গঙ্গার পলি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে।

এই সময় এক ব্রোকার ভদ্রলোক জুটেছিলেন তাঁর কথা না বলে পারছি না। পাঞ্জাবীর ঝুল হাঁটুর নীচে, ঢোলা আস্তিন হাত থেকে ইঞ্চি চারেক বেশী ঝুলছে, কাঁধের কাছে জামাটা ঘামে, তেলে বিবর্ণ, দুলকি চালে অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণে অক্লান্ত। তাঁরও যেন একটা নেশা জমি দেখানোয়, হেঁটে হেঁটে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেও উনি নির্বিকার। আর কতদূর—জিজ্ঞাসা করলেই উনি বলতেন—এই নিকটেই। নিকট যে এত দূর হতে পারে, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই কল্পনা করতে পেরেছিলেন। গাড়ি ভাড়া এবং চা পানি ছাড়া কোনো টাকাই তিনি নেননি। আমাদের যেমন জমি দেখার নেশা ওঁরও বোধহয় দেখানর নেশায় পেয়ে বসেছিল।

যোগাযোগ

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে প্রধান পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। আমরা দু তিন জন তখন প্রায়ই আয়কর ভবনের Consumer Cooperative Store-এ যেতাম।

সেটা অত্যন্ত সুপরিচালিত ও স্বচ্ছল ছিল, প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি মাসের প্রথমে সভ্যদের বাড়ি পেঁছে দেবার ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। এইখানেই পরিচিত হলাম কয়েকটি মানুষের সঙ্গে, উত্তর-জীবনে যাঁদের সঙ্গে যোগ অবিচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ একটা মাহেন্দ্রক্ষণে, কেননা পরবর্তীকালে যে বিরাট কর্মকাণ্ডটি ঘটেছিল সেটা দুই পক্ষের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব হত না। এঁদের কাছে জানলাম যে জমি ওঁরাও খুঁজছেন সমবায় বাসস্থানের উদ্দেশ্যে। এখানেই খোঁজ পেলাম যে গড়িয়া ষ্টেশনের পূর্বদিকে এক হাজার বিঘার মত একটা ভেড়ি এবং চাষ সম্বলিত জমি আছে, সেটার মালিক Suburban Agriculture Dairy and Fisheries Ltd. নামে এক কোম্পানী যার অন্যতম ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান ছিলেন কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের ভূতপূর্ব বিখ্যাত সভাপতি কুমার মিত্র। এই জমিটি একটা Adjudication-এর বলে Estate Acquisition Act, 1953-র আওতা থেকে মুক্ত ছিল, যদিও ঐ অঞ্চলের আর সমস্ত জমির মত ওর ওপর সরকারী সেচ বিভাগের এবং মৎস্য বিভাগের Acquisition Act-এর Section 4 অনুযায়ী নোটিশ ছিল—সেচ বিভাগের নোটিশ, কেননা ঐ খানে লবণ হ্রদের ত্রয়োদশ সেক্টর হবে আর মৎস্য বিভাগ ওখানে নাকি ৫২ ফুট উঁচু বাঁধ দিয়ে বর্ষার জলসংরক্ষণ করে মৎস্য চাষ করবেন। পরিকল্পনা অপূর্ব সন্দেহ নেই, তবে এর রূপায়ণ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

যাই হোক, কুমার মিত্রের উত্তর কলকাতার বাড়িতে কয়েকবার বৈঠক হল। কুমার মিত্র বিশাল বপু, গম্ভীর, রাশভারি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। উনি সমস্ত জমিটা ন' লাখ টাকায় ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন যদি ওখানে কোনো সমবায় প্রতিষ্ঠান কোনো উপনগরীর পত্তন করতে পারেন, কেননা ১৯৬৬-৬৭ সালেও মধ্যবিত্তের আবাসন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গড়িয়ার এই জায়গাটি পূর্ব কলকাতার লবণাক্ত জলাভূমির অংশ। গড়িয়া জায়গাটি প্রাচীন, যদিও রেল ষ্টেশনে ১৯৬৮ সালেও কেরোসিনের বাতি জ্বলত। অদূরে গড়িয়া ষ্টেশন রোড দিয়ে গিয়ে বৈষ্ণবঘাটা এবং গড়িয়ার বাস টার্মিনাস। মধ্যে পড়ে Tolly Nullah বা স্থানীয় নাম গড়ে-খাল, সেই খালের ওপর বড় ব্রিজ। এই খালটি ক্রমশ পূর্বদিকে ঘুরে গড়িয়া ষ্টেশন রোডের পাশাপাশি এসে পাঁচপোতার পূর্বে গিয়ে আগেকার বিদ্যাধরী নদীতে পড়ে সুন্দরবনের দিকে গিয়েছিল। হেষ্টিংস থেকে Major Tolly এই খালটি কেটেছিলেন অর্ন্তদেশীয় পরিবহনের জন্য, এটা সকলেরই জানা।

যে জমিটি নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছিল তার অবস্থান পূর্বদিকে ঘুরে যাওয়া গড়ে-খালের উত্তরদিকে। গড়িয়া রেল ষ্টেশন এবং তৎসংলগ্ন গড়িয়া ষ্টেশন রোডের উত্তরে প্রবাহিত এই খালটি ২৫ ফিটের মত সরু হয়ে উক্ত জমিটিতে আসার পথ বিচ্ছিন্ন করেছে। অর্থাৎ রেল ষ্টেশন থেকে অথবা সড়কপথে জমিতে পেঁছিতে হলে ঐ ২৫ ফিটের বিভাজনকে একটা নারকেল গাছের গুঁড়ির ওপর দিকে পার হয়ে আসতে হবে। এই বিভাজনটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ যাকে বলে crucial. এ ছাড়া অবশ্য বাস-গড়িয়া থেকে গড়ে-খালের উত্তর ধার দিয়ে রেলপথের একটি কালভার্টের তলা দিয়ে জমিটিতে পেঁছান যেত, তবে কাঁচা মাটিতে সব সময় গাড়ি চলত না। সুতরাং, এই জমিটি পশ্চিমে রেললাইন এবং দক্ষিণে অদূরে গড়ে-খাল দিয়ে আবদ্ধ, সুরক্ষিতও বটে। এই সময়েই বিধান রায় প্রবর্তিত Calcutta Metropolitan Planning Organisation (CMPO) Basic Development Plan নামে একটা সমীক্ষা প্রকাশ করে—কলকাতা নিয়ে এইরকম সমীক্ষা পূর্বে কখনও হয়নি। Eastern Metropolitan Bye Pass নামে যে প্রধান সড়কটি কলকাতার পূর্বদিক দিয়ে সল্টলেক থেকে বাঘাযতীন রেল ষ্টেশন পেরিয়ে পশ্চিমে ঘুরছে, এটিও তখনই প্রস্তাবিত।

যাই হোক, এরকম কথাবার্তা যখন চলছে, তখন একজন অত্যন্ত করিৎকর্মা লোকের আগমন ঘটল এক ব্রোকারের মাধ্যমে। লম্বা, চওড়া চেহারায় পড়তি আভিজাত্য, যথেষ্ট শিক্ষিত, তিনি নিজেকে শিল্পপতি বলেই পরিচয় দিলেন। বললেন—গড়িয়ার ঐ হাজার বিঘা জমি উনি পঞ্চাশ হাজার টাকায় বায়না করে রেখেছেন, সরকারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে যে ঐ জমিতে উনি মুর্গি, শুয়োর ইত্যাদির খামার করবেন, বাসস্থানেরও প্রস্তাব আছে, যদি মৎস্য ও সেচবিভাগ তাদের Notice তুলে কিছুটা জমি ছেড়ে দেয়। যদিও আমরা কুমার মিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম তবু দুটি সমস্যায় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। প্রথম, সরকারী Notice-এর জমি কেনার ঝুঁকি ছিল (যদিও Section 4-এর blanket notice তখন প্রায় সব বড় জমিতেই, এবং কয়েকটি সমবায় সমিতি তৎসত্ত্বেও সেরকম জমি কিনেছিল), দ্বিতীয়, ন লাখ টাকা তুলে একহাজার বিঘা জমির নিয়ে কোনো প্রকল্প সফল করার অনিশ্চয়তা। তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে যদি সেই ভদ্রলোক, মিঃ ধর, Section 4-এর Notice ওঠাতে পারেন তবে ওঁর কাছ থেকেই আমরা প্রয়োজনীয় জমি নির্দিষ্ট দরে নেব। এইভাবে ৬৬-৬৭ সাল কেটে গেল।

পত্তন

পরের বৎসর, অর্থাৎ '৬৮ সালের গোড়ার দিকে আমরা জানতে পারলাম যে হাঁজার বিঘার মধ্যে ৩৬০ বিঘার মত জমি থেকে সরকার নোটিশ তুলে নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশ করেছেন। আমরা তখন কাঠা প্রতি ৫০০ টাকা হিসাবে তুলে ফেলেছি, কিন্তু নোটিশ দেওয়া জমির জন্য সভ্যদের টাকায় বায়না করা উচিত মনে করিনি। কাজেই, এখন এই ভদ্রলোকের আমাদের জমি দেওয়ার কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। আরো মুস্কিল হল এই যে, এঁরই broker-এর সঙ্গে

আমাদের ভুল বোঝাবুঝির ফলে ভদ্রলোক আমাদের ওপর চটেছিলেন এবং জমি ছাড় পাওয়ার পর ঘোষণা করলেন যে তিনি ইনকম ট্যাক্স সোসাইটিকে ১০০ বিঘার মত জমি দিতে পারবেন কিন্তু এ. জি. সোসাইটিকে তিনি কোনো জমি দেবেন না। ইতোমধ্যে ইনকম ট্যাক্স সমিতির উদ্যোক্তারা আয়কর গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি নামে তাঁদের সমিতিও রেজিষ্ট্রি করেছেন।

আমরা দেখলাম সমূহ বিপদ। এদিকে চার লাখের ওপরে টাকা তোলা হয়ে গেছে, সভ্যরা অনেকেই ধার কর্জ করে, এমনকি বাড়ির গহনাপত্র বাঁধা দিয়েও এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থান করেছেন, এখন তাঁদের কাছে এতবড় আশাভঙ্গের খবর দেবই বা কি করে।

তখন একদিন ইনকম ট্যাক্স সোসাইটির সম্পাদক—ছোটোখাটো স্থূলপবাক মানুষটির সঙ্গে হাইকোর্ট পাড়ায় একটা ঘরে পরামর্শ করলাম। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

স্থূলপবাক মানুষটি স্থূল এবং স্পষ্ট ভাষাতেই বললেন যে যখন এই কাজে দুপক্ষ নেমেছি তখন দুপক্ষই একত্রে কাজ করব, নতুবা করবই না। ভদ্রলোককে চিনলাম খুব মৌলিক ভাবে। সে চেনা আজও অব্যাহত।

অতঃপর ১৬ই জুলাই ১৯৬৮ সালে আলিপুরের সাবরেজিস্ট্রেশন অফিসে একই দিনে ১৭০ বিঘা জমি সেই ভদ্রলোক Suburban Agriculture Dairy and Fisheries Ltd.-এর কাছ থেকে দুহাজার টাকা বিঘা হিসাবে কিনে, চার হাজার টাকা বিঘা হিসাবে আমাদের দুই সোসাইটিকে একত্রে ৯৯৯ বছরের লিজ দিলেন। দলিলে উল্লেখ থাকল যে দুই সোসাইটি ইচ্ছা করলে পরবর্তীকালে সাড়ে চার হাজার টাকা বিঘা হিসাবে, অর্থাৎ আরো পঁচাশি হাজার টাকায় জমির freehold right নিতে পারবে। একই দিনে উল্লেখিত রেল-কালভার্টের তলায় আরো ৩ বিঘা জমি কেনা এবং সেই সঙ্গে প্রায় এক বিঘা জমিতে

সর্বপ্রকার ব্যবহারের স্বত্ব নেওয়া হল যাতে গড়ে-খাল থেকে কিছু উত্তরে রেললাইনের পূর্বদিকে একলপ্তে একটা আয়তক্ষেত্রের আকারে অখণ্ড জায়গা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে, এই ভাবে পঞ্চসায়রের পত্তন হল।

দীঘি

পত্তন ত হল। এখন কাজ হল এই ১৭০ বিঘা ভেড়ি ও ধান জমিকে বাস্তু জমিতে পরিণত করা। সেটা করার একমাত্র এদেশী উপায় হচ্ছে এর ওপর আরো মাটি ফেলে জমিটাকে উঁচু করা। একেই ত সকলে জানে যে ব্যাঙে 'ইয়ে' করলে কলকাতা ডুবে যায়, তখন কলকাতার পূর্ব প্রান্তে আরো নাবাল ধান জমিকে বাস্তু করতে হলে কতটা উঁচু করতে হবে এবং সে মাটি আসবে কোথা থেকে? সুতরাং, আরো জমি চাই, যার থেকে মাটি নিয়ে এই জমিতে ফেলে উঁচু করতে হবে, আর সেই খোঁড়া জমিতে হবে দীঘি। কিন্তু কতটা উঁচু করতে হবে কতখানি জমিকে, এবং কতটা থাকবে জল, এটা একটা চিরকালের কঠিন সমস্যা। জল আর মাটি নিয়ে হল পৃথিবী, তার তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলের হিসাবে চললে আমাদের জলচর অথবা উভচর জীব হতে হয়, কিন্তু উল্টোটা হলে আমাদের পায়ের তলায় মাটি থাকে এবং মাটির ওপর বাড়ি থাকে। অতএব ঐ বৎসরেই Suburban Agriculture Dairy and Fisheries Ltd. অর্থাৎ সরাসরি জমির মালিকের কাছ থেকেই দুটি সোসাইটি ৩০০ ফিট চওড়া আরো ৬৯ বিঘা জমি কিনল লাগোয়া ১৭০ বিঘার পূর্বে। ৩০০ ফিট চওড়া ২৭ বিঘের মত একটা ফালি উত্তরে পড়ে রইল, বাকী ৪২ বিঘা আগের আয়তক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হল। এই জমি freehold কেনা হল, এক লক্ষ একষট্টি হাজার টাকায়, যার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা ষাণ্মাষিক কিস্তিতে দেওয়া হবে। আরো রেললাইনের সমান্তরাল জমি কেনার চেষ্টা চলতে লাগল, গড়ে-খাল থেকে উপনগরীতে পৌঁছবার চওড়া পথ চাই ত।

এমনি করে ১৯৬৮ সাল গেল। হাতে রইল মাত্র পাঁচ ছ মাস সময় যার মধ্যে দীঘি কেটে মাটির কাজ সুরু করতে হবে গ্রীষ্মের প্রথমেই, বর্ষা নামার আগে পর্যন্ত। এই কাজটিই এর মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গীন ও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিমাণমত মাটি তুলতে হবে নতুবা খরচ বাড়বে, সময় পিছোবে, ফলে পরিকল্পনাটি সুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

উপনগরীর একটা প্রাথমিক নক্সা বা base plan তৈরী না করে এগোন যায় না। আর সেই নক্সার পরিপ্রেক্ষিত হবে ground level বা ভূমির উচ্চতা কতখানি হবে সেটা ঠিক করা, তাহলেই কতখানি মাটি লাগবে এবং তার জন্যে কতখানি মাটি খুঁড়তে হবে সেটা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কাজটি সহজ ছিল না এবং সমস্ত পরিকল্পনার চাবিকাঠিই ঐটি।

প্রাথমিক নক্সাটা করে দিলেন তখনকার CMPO-র Senior Land Planner গোপাল চৌধুরী এবং তাঁর সহকারী শ্রীচট্টোপাধ্যায়, একদিনেই এবং বিনা পারিশ্রমিকে, এটা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এখন স্মরণীয়। পরে অবশ্য এর ওপর ভিত্তি করে একটা পূর্ণাঙ্গ Project report তৈরী করলেন আমাদের উপদেষ্টা এঞ্জিনীয়র শ্রীনৃপেন বক্সি, তাতে ১৫০০ টাকা কাঠা হিসাবে প্লটের দাম নির্ধারিত করেছিলেন। খানিকটা আশ্চর্য এবং গর্বের কথা এই যে, মোটামুটি ঐ দামেই আমরা সভ্যদের প্লট দিতে পেরেছিলাম।

এই নক্সায় দীঘিগুলির অবস্থান রাখা হল এমনভাবে যে দীঘির থেকে মাটি ভর্তির জায়গার দূরত্ব (lead) একশ ফিট ব্যাসার্ধের এবং দীঘির গড় গভীরতা (lift) কুড়ি ফিটের মধ্যে হয়, নতুবা মাটি ভরার কাজে লোক বেশী লাগবে, সময় এবং খরচ বেশী হবে। এর মধ্যে আমরা PWD-র Mechanical Division-এ dragline ইত্যাদির চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে ছিল অকেজো ও তার আসার কোনো রাস্তা

ছিল না। কাজেই সমস্ত মাটির কাজ টেণ্ডার ডেকে দুই labour contractor-এর মধ্যে ভাগ করে দিলাম। পরে কাজের তদারকির জন্য একজন surveyor রাখা হয়েছিল।

ঠিক পরের বছর একই দিন, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের পনের, ষোল জুলাই হবে। গোটা মাঠে হোগলা পাতার ছাউনি করে, টিউবওয়েল খুঁড়ে, দুই কনট্রাকটরের পাঁচশো করে এক হাজার শ্রমিক কাজ সুরু করার জন্য তৈরী, মাঠটা যেন এক রণক্ষেত্র। এমন সময় স্থানীয় কিছু লোক, যারা ঐ জমির চাষী ছিল বলে পরিচয় দিল এবং বলল, তারা ওখানে মাটি কাটতে দেবে না, যদি না তাদের বিকল্প চাষের ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত মাঠ থমথমে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, কাজ সুরু করা যাচ্ছে না। সকলের মাথায় হাত। সুরুতেই এতবড় বাধার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কেউই। আমাদের কিছু উদ্যোক্তা স্থানীয় কৃষক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

তখন আমাদের জমির দক্ষিণেই Suburban Agriculture Dairy and Fisheries Ltd-এর একটা বাঙলো বাড়ি ছিল, লোকে বলত কাছারি বাড়ি। সেখানে পরামর্শ সভা বসল। অবশেষে ঐ জমির মালিক যাঁরা আমাদের ৬৯ বিঘা জমি সরাসরি বেচেছিলেন, জমি delivery দিয়েছিলেন এবং যাঁদের ওই জমি সম্পর্কে আর কোনো দায় ছিল না, তাঁদের সম্পাদককে তখনই রাজি করান হল যে জমি বেচার ফলে যে চাষীরা বৃত্তিচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদের অন্যত্র সমমূল্যের সমপরিমাণ জমি দেবার প্রতিশ্রুতি লিখে দেবার জন্য। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি লিখে দিলেন, সমবেত চাষী এবং স্থানীয় লোকের প্রকাশ্য সভায় সেই প্রতিশ্রুতি পড়া হল, তাঁরা এই ব্যবস্থায় রাজি হলেন। জমির ওপর হাজার কোদালের কোপ পড়ল তখনই, নইলে হয়ত পড়ত না কখনই, বা কত দেরী হত কে জানে। বাইরে, সমস্ত মাঠে তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

এবার জমি কতটা উঁচু করতে হবে, মাটির কাজ সুরু করার আগে

এই ছিল প্রধান প্রশ্ন। নানাভাবে, আমাদের কন্সাল্টিং এঞ্জিনীয়র এবং আরো অনেক expert নানা হিসাব দিলেন; কেউ কেউ বললেন রেললাইন সমান অর্থাৎ দশ বার ফিট উঁচু করতে হবে—সে এক হাস্যকর ব্যাপার। এই সম্পর্কে পূর্বোক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর একটা মূল্যবান কথা মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—The experts will only confuse you. Watch the land yourselves throughout the year. ঘন বর্ষার শেষে, জলের ওপর জেগে থাকা আল থেকে জমা জলের গভীরতাই হল মাপকাঠি। একদিন উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন অফিসে এলেন একটু দেরীতে, হাতে একটা ছড়ির মত। জিজ্ঞাসা করাতে বললেন—গড়িয়ার জল মাপছিলাম এবং হাতের ছড়িটির গায়ে কয়েকটা দাগ দেখালেন। হাতের ছড়িটি ঐ মাঠে একমাত্র বৃক্ষ একটি খেজুর গাছের একটা কাঠি। অতঃপর সমস্ত জমিটার একটা contour survey করা হল এবং অবশেষে যথেষ্ট উত্তপ্ত এবং চিন্তিত আলোচনার পর স্থির হল আমাদের উপনগরীর উচ্চতা হবে যাকে এঞ্জিনীয়ারিঙের ভাষায় বলে 11·4 PWD। বাংলা মতে গড়ে তিন থেকে চার ফুট জমিটিকে উঁচু করতে হবে। মোটমাট হিসাবটা হল প্রায় ১৮৬ বিঘা (পরে কেনা আরো ১৩ বিঘা সমেত) জমির মধ্যে পাঁচটি দীঘির মোট আয়তন ৪২ বিঘার মত বাদ দিয়ে নীট ১৪৪ বিঘা জমি উঁচু করতে হল, দীঘির গড় গভীরতা আঠার উনিশ ফুটের মত, মাটির কাজ হল এক কোটি পঁচিশ লক্ষ ঘন ফুট, খরচ পড়ল ন'লাখ টাকার মত, সময় লাগল তিনটি গ্রীষ্ম। উদ্বৃত্ত মাটি যা থাকল, তাতে দুই আর তিন নম্বর দীঘির মধ্যে (এখন যেটা খেলার মাঠ) ইঁটের ভাটায় (Brick kiln) ত্রিশ লাখের মত ইঁট তৈরী হল labour contract দিয়ে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে মাটির কাজের মত elusive কাজ খুব কমই আছে। এতে হাত পাকানো কনট্রাকটরদের

সম্পর্কে অডিট অফিসে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আমাদের দুজন কনট্রাকটরের ওপর একজন সার্ভেয়ার ছিলেন কিন্তু সর্বোপরি মাটির হিসাবটা নিজেরা বুঝে, নিজেরা লেভেল দেখে পরীক্ষা করতাম। শুধু হাতের শ্রমে এতবড় মাটির কাজে কোথাও কোনো শৈথিল্য দেখাইনি, কারণ জানতাম এই ভিত্তিভূমিতে গোলমাল হলে সমস্ত পরিকল্পনাটি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর ১৭০ বিঘা জমির lease rightটা freehold করে নেওয়া হল, কিন্তু পঁচাশি হাজার টাকার বদলে পনের হাজার টাকায়, তাও কিস্তিতে। উপরন্তু, আরো বার বিঘা জমি কেনা হল গড়ে-খাল পর্যন্ত রাস্তার জন্য এবং তের বিঘার মত কেনা হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লাগোয়া, যার অর্ধেকটা পড়ল উত্তর সীমা ছাড়িয়ে পাশের জমির মুখ আটকে। এইখানে একটা মজার সিদ্ধান্ত হল, পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের সঙ্গে। আমাদের প্রস্তাব মত পার্শ্ববর্তী জমির মুখে আমাদের ছ বিঘার জমির পরিবর্তে সমপরিমাণ জমি দিয়ে আমরা আমাদের উত্তর সীমা প্রসারিত করে দিলাম। এতে উভয়পক্ষেরই লাভ হল। পার্শ্ববর্তীর সম্মুখ (frontage) খুলে গেল এবং আমাদের দুই সারি প্লট বেরোল—সমস্ত ভূমির সীমা সরল রেখায় এলো। এতে রাস্তায়, প্লটে সবদিকেই সুসঙ্গতি হয়, জমির পুরো ব্যবহার হয়, অতএব খরচের সাশ্রয় হয়। এখানে একটা কথা বলা দরকার, যেটা এককালে কিঞ্চিৎ অসুবিধার কারণ হলেও, অধুনা এক বিরাট সম্ভাবনার সূচনা করেছে।

আগেই বলেছি ১৯৬৮ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ৬৯ বিঘা জমি কিনেছিলাম ১৭০ বিঘার লাগোয়া পূর্বদিকে সেটা ৩০০ ফিট চওড়া একটা ফিতের মত, যার ২৭ বিঘা সোজা একটা projection-এ এখন যেখানে Eastern Metropolitan Bye Pass পূর্ব থেকে পশ্চিম বাঁকে এসেছে প্রায় সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ২৭ বিঘা জমি একটা উপবন, হাসপাতাল, বাজার প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এসব

করা দুই সোসাইটির সাধ্যের বাইরে থাকায় ওটা রক্ষা করাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ সেটা lease দিয়ে একটা Super-speciality হাসপাতাল ফরাসী বিশেষজ্ঞের সহায়তায় তৈরী হওয়ার সূচনাতে সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হল।

আগেই বলেছি আমাদের আবাসস্থলে পৌঁছানর মূল সমস্যা ছিল দক্ষিণে গড়ে-খালের ২৫ ফুটের বিভাজন। এই সমস্যা সম্পর্কে আমরা প্রথম থেকেই অবহিত ছিলাম এবং এজন্য প্রথম জমি কেনার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালেই সরকারের কাছে একটা memorandum দিই। দক্ষিণে গড়ে-খালের ওপর একটা সেতু করে সোজা আমাদের ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা ধরে রেললাইনের পূব দিক দিয়ে উত্তর দিকে বাঘা যতীন ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তা করে লেভেল ক্রসিং দিয়ে বাঘাযতীন রোডে সংযোগ করে দিলে রাজা সুবোধ মল্লিক রোড ধরে গড়ে-খাল প্রদক্ষিণ করে গড়িয়া রেলষ্টেশন আসার প্রায় মাইল তিনেক দূরত্ব কমে যায়। এর ফলে যাতে বাঘাযতীন ষ্টেশনের দক্ষিণে রেললাইনের পূর্বদিকে Commint প্রভৃতি যে সব সরকারী সমবায়ী সংস্থা জমি নিয়েছিলেন, তাঁদের উপকার হয়, বাঘাযতীন ষ্টেশনের দক্ষিণে রেললাইনের পূর্বদিক বরাবর একটা পরিকল্পিত সমবায়ী অঞ্চল গড়ে ওঠে। এই memorandum এর অনুলিপি আমরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, CMDA প্রভৃতিকে দিই। প্রথমে দিকে আমরা সেচবিভাগের তৎকালীন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির কাছ থেকে ভালোই সাড়া পাই এবং গড়ে-খালের ওপর একটা ব্রিজ করার অনুমতি চাইলে, সরকারী খরচায় ব্রিজ করার প্রস্তাব তাঁর কাছ থেকেই আসে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের এত ঘুরতে হয়েছে সরকারের বিভিন্ন Department ও Directorateএ, CMDA, CMWSA-তে যে সেটা ভয়াবহভাবে স্মরণীয়। মোট অভিজ্ঞতা হল কেউ হাঁ অথবা না কোন সিদ্ধান্ত নিতে চান না। শেষে ব্যাপারটা CMDA এর ঘাড়ে

পড়ল, তাঁরা আশ্বাস দিলেন সেতুবন্ধনের। কিন্তু আরো অনেকদিন অপেক্ষা এবং ঘোরাঘুরি করার পর একদিন টেলিফোনে শীতল কণ্ঠের একটি জবাব এল-ব্রিজ করা যাবে না, ফান্ড নেই। এই না করার নিষ্পত্তির জন্য এতদিনের অপেক্ষা এবং প্রায় চার বছর ধরে '৭৩ সাল পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে আমরা ধৈর্যের শেষ সীমায় পেঁাছে গেছলাম। সেইসময় হঠাৎ একদিন ঐ নারকেল গুঁড়ির ওপর দিয়েই যেতে যেতে যাকে আমি 'বাঙাল' বলতাম, সে বলল—হালার ব্রিজ আমরাই করুম। বাঙালের গোঁ আর এক নিষ্পত্তির দিকে ঠেলে দিল বিপত্তির মধ্য দিয়েই।

এর মধ্যে, অর্থাৎ ৭৩ সালের মধ্যেই পাঁচটা দিঘী করে মাটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, উদ্বৃত্ত মাটি দিয়ে লাখ কুড়ির মত ইঁট তৈরী হয়েছে এবং রাস্তার জন্য caging অর্থাৎ পুনর্বার মাটি খুঁড়ে ইঁট বসানোর ব্যবস্থা সুরু হয়ে গিয়েছে। আর একটা কাজ হল। পাঁচ নম্বর দীঘির কিছু মাটি দিয়ে 'লাট' এর ইঁট দিয়ে জমির পূর্ব সীমার মাঝামাঝি মাত্র কুড়ি টাকা বর্গ ফুট হিসাবে মোট ১৬২০ বর্গ ফুটের ভিতের (plinth area) ও ২৫ ইঞ্চি দেওয়ালের দুখানা ঘর এবং অনুরূপ চওড়া বারান্দা-ওয়ালা একটা পাকা বাড়ি তৈরী হল, মাঠের মাটির থেকেই বাড়িটা তৈরী হল, শুধু লোহার ছড় এবং গ্রিল ইত্যাদি আনা হল ঐ গুঁড়ির ওপর দিয়েই। আমাদের কন্সাল্টিং এঞ্জিনীয়ার বললেন—বাড়িটা যেন মাথায় করে এনে মাঠে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঠিক বর্ণনা। এটাই পরে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং হয়। এটা করা হল পরীক্ষামূলক ভাবে, আগে ফেলা মাটির ঘনত্ব (compaction) পরীক্ষা করে এবং মাত্র ৩½ ফিট গভীর ভিত দিয়ে। দেখা গেল তিনটি গ্রীষ্মে তোলা মাটি চারটি বর্ষায় ৮০ শতাংশ ঘনত্ব পেয়েছে। এই সঙ্গে একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে। তখন সামনে double brick soling করা প্রধান রাস্তাটির কাজ চলছে। soling হয়ে গেছে, খোয়া ফেলা হয়ে গেছে, মাটি দিয়ে, হাতে টানা রোলার (৫ টন বোধ হয়) দিয়ে রাস্তা সমান

করতে হবে। করতে গিয়ে দেখা গেল মাটি এক ইঞ্চিও বসছে না —একদিন মাঠে উপস্থিত হয়ে দেখি রাস্তার ওপর রোলারের shaft টা উল্টে পড়ে, রোলার বিচ্যুত। তখন বাংলাদেশের যুদ্ধ সবে শেষ—মুজিবর রহমান একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বাঙালি বাংলার মাটির মত, বর্ষাকালে কাদা হয়ে নরম, কিন্তু 'চিত্তিরমাসে' তাতে মাথা ঠুকলে মাথা ফেটে যায়। মাটির নানা রূপের সঙ্গে এই সময় খানিকটা পরিচয় ঘটে। পরে অবশ্য রাস্তার জন্যে এঞ্জিন দেওয়া বড় রোলার আনতে হয়।

মার্চ '৭৪ সালের মধ্যেই রাস্তার ইঁট বসানো (brick soling) প্রায় তিন চতুর্থাংশ শেষ হয়েছিল। ইঁট পাওয়া গেল তিন নম্বর দীঘির উদ্বৃত্ত মাটির ইঁটের ভাঁটা থেকে। দুতিনটি বাদে সব রাস্তাই ৩২ ফুট, দুটো ৪০ ফুট ও রেললাইনের সমান্তরাল প্রধান রাস্তাটি ৬০ ফুট চওড়া উপনগরীর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত। সেখান থেকে ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা খোয়া, রাবিশ ফেলে মধ্যে একটা কালভার্ট করে নিয়ে যাওয়া হল ঐ গড়ে খাল পর্যন্ত। এর জমি ১২ বিঘা আগেই কেনা হয়েছিল। মোটামুটি পঞ্চসায়রে রাস্তা আছে প্রায় ছ মাইল মোট দৈর্ঘ্যের, কলকাতায় ছ শতাংশ রাস্তার তুলনায় সমস্ত উপনগরীতে রাস্তার অনুপাত বোধ হয় প্রায় ২৫ শতাংশ। রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে চলল ড্রেন কাটা, সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানর জন্য।

অগষ্ট '৭৩ সালেই এজি সোসাইটি এবং কিছু পরেই আয়কর সমিতি preference এর ভিত্তিতে লটারী করে সভ্যদের প্লট বণ্টন করল। প্রতি সোসাইটির প্রায় ৩০০ করে প্লট, ছটা পর্যন্ত preference দেওয়া হয়েছিল। সকলেই আশায়, উৎসাহে উদগ্রীব। অনেকেই খুব ভালো প্লট পেলেন, কেউই খারাপ প্লট পাননি কেননা খারাপ প্লট ছিল না। প্লট অনুসারে অল্প rebate ও surcharge ধার্য ছিল প্রতি কাঠা ১৫০০ টাকার উপর। এই জটিল কাজটিও নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছিল।

সেতু

দুই সোসাইটি সিদ্ধান্ত করল গড়ে-খালের ওপর ব্রিজ নিজেরাই তৈরী করবে। কিন্তু নিজেরা করলে সরকারী অনুমতি চাই—এতদিন সরকার তৈরী করবে এই আশায় ঘোরা হয়েছে, এবার অনুমতি ত্বরান্বিত করতে হবে। কাজেই আমরা সেচ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট এস. ডি. ওর কাছে গেলাম। এরকম কাজে আমরা উদ্যোগী দেখে যুবক ভদ্রলোক সহানুভূতি দেখালেন এবং আমরা লোহার গার্ডারের ওপর পাকাপোক্ত ২৫ ফুট চওড়া কংক্রিট ব্রিজের নক্সা তাঁর কাছে দাখিল করলাম ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য।

কিছুদিন হল কোনো অনুমোদন আসে না, এস. ডি. ও ভদ্রলোক বলেন যে তিনি বহুদিন হল উপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা আর একটু অনুসন্ধানেই জানতে পারলাম নক্সাটা বিশেষ ঊর্ধ্বগামী হয়নি, ঠিক অদৃশ্য নয়, দৃশ্য স্থানেই আটকে আছে। সেখানে আবার তদ্বির, কিন্তু বোঝা গেল কোনো অজ্ঞাত কারণে ওখান থেকে নড়বে না।

আমাদের আর ধৈর্য ছিল না। একে সরকারের দেওয়া আশার পিছনে বছর তিনেকের ওপর ঘুরেছি, তারপর জনস্বার্থে একটা ব্রিজ নিজেদের টাকায় করব তারও অনুমতি মিলছে না। আমরা এবার উঁচুর দিক থেকে ধরব ঠিক করলাম।

স্বয়ং মন্ত্রীমশাই-এর ঘরের বাইরে গোটা একদিন অপেক্ষা করার পর শুধু তাঁর কাছ থেকে দরখাস্তটির ওপর Please see to it গোছের একটা নির্দেশ পেয়েছিলাম এবং সেই সূত্রে একদিন সেচবিভাগের Engineer-in-chief এবং Chief-Engineer শ্রী বি. এন. ব্যানার্জীকে শেষোক্তের ঘরে একসঙ্গে ধরলাম। এঁরা আমাদের কথা শুনলেন এবং পরস্পর সম্মতও হলেন যে যতশীঘ্র সম্ভব একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁরা যতদূর স্মরণ হয় Irrigation Construction Division-এ আমাদের পাঠালেন নির্দেশ দিয়ে।

যাই হোক, সরকারের নিয়মনীতি অনুসারে Inspection হল এবং ঐ Division অনুমতি দেওয়ালেন বটে, তবে গড়ে-খালের ওপর শাল বল্লার ঠেকনো দিয়ে একটা বড় কাঠের ব্রিজের।

আগেই বলেছি এই সেতুবন্ধের ওপর সমস্ত উপনগরীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল, কেননা মাঠে যে কাজ করার ছিল, মাটি ব্যবহার করে তা নিঃশেষ করা হয়েছে, কিন্তু ছয়শ'র মত প্লটে বাড়ি করতে হল মালমশলা আনার জন্য বড় লরি বারবার যাতায়াত করার মত পাকাপোক্ত ব্রিজ চাই সড়ক পথের সংযোগে।

ঐ অনুমতি নিয়েই শালবল্লা দিয়ে পাড় বেঁধে চারটে বড় মোটা লোহার গার্ডারের ওপর পুরু কংক্রিট ব্রিজ করে ফেললাম আমাদের পূর্বের নক্সা অনুযায়ী। এটা দু মাসেই তৈরী হল, সেতু উদ্বোধন করলেন বড়মিস্ত্রী রামেশ্বর। এতদিনে গড়িয়া স্টেশন রোড দিয়ে বাইরের সড়কের সঙ্গে রেললাইনের পূর্বদিকের যোগাযোগ সম্ভব হল।

ব্রিজ হওয়ায় সকলেই যখন উল্লসিত তখন অফিসে একদিন টেলিফোন পেলাম সেই এস. ডি. ও.-র কাছ থেকে—ও মশায় শীগগির আসুন আমার চাকরী যায়, আর আপনাদের ব্রিজও। জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম Chief-Engineer শ্রী ব্যানার্জি বলেছেন যে ব্রিজ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। এবার কিঞ্চিৎ ভয় পেলাম।

প্রথমে গেলাম এস. ডি. ও. ভদ্রলোকের কাছে। তিনি বললেন—বড়সাহেবের (Chief-Engineer) অফিস থেকে ফোন এসেছিল, তাঁরা জানতে চেয়েছেন আমরা গড়ে-খালের ওপর কংক্রিটের ব্রিজ কেন করেছি, ত আমি বল্লাম তাই ত করার কথা, আমি সেই রকমই recommend করেছি, তাতে ওঁরা বল্লেন ও ব্রিজ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। ব্যাপার কি বলুন ত?

শুনে এই সংকটেও হাসি পেল। বললাম—একটা Tragedy বা Comedy of Errors হয়েছে। কম্যুনিকেশন গ্যাপ। আমরা

কাঠের ব্রিজের অনুমতি পেয়েছিলাম, সেটা তাড়াতাড়িতে আপনাকে জানান হয়নি। এখন উপায় ?

উনি বল্লেন—আমার কিছু করার ত নেই। খোদ বড়সাহেব ওধারে ট্যুরে গিয়ে দেখে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। উনি ভাল লোক।

অনতিবিলম্বেই শ্রী ব্যানার্জির অফিসে আমরা জনা তিনেক তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। নমস্কার করেই বললাম—অন্যায় করেছি।

সৌম্যদর্শন মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীর এবং রক্তাভ হল। আমরা একটা আবেদন নিয়ে গেছলাম, তাতে প্রথমেই ইচ্ছাকৃত ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছিল এবং অত বড় কাঠের ব্রিজ বানানোর সম্ভাব্যতা, বিশেষ করে সেটার রক্ষণাবেক্ষণের (maintenance) জন্য ঘন ঘন মেরামতের সমস্যা এবং তজ্জনিত আর্থিক সামর্থহীনতা বিবেচনা করে অনুমোদন বিরুদ্ধ কাজ করেছি সদুদ্দেশেই, একথা বিশদ করা ছিল। শ্রী ব্যানার্জি সমস্ত আবেদনটা মন দিয়ে পড়ে একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন—আপনারা নির্দেশ মত কাজ করেননি, I shouldn't have co-operated with you. আমরা পুনর্বার দোষ স্বীকার করে বললাম—অতটা গুরুত্ব দিইনি, তবে এই প্রথম ও শেষ।

আমাদের মধ্যে কোনো চালাকি ছিল না। সৎ এবং নিয়মনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারী মহলে দুটো সোসাইটির সম্পর্কে কিছু সদিচ্ছা ও সুখ্যাতিও বোধ হয় ছিল। ব্যানার্জি সাহেবের মুখ যেন একটু স্মিত হল, বললেন—দেখি, কি করতে পারি।

সেই ব্রিজ আছে, কিন্তু ব্যানার্জি সাহেব নেই। এই সৌম্য, সহানুভূতিশীল মানুষটিকে আজো মনে পড়ে।

আবাস

১৯৭৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী উপনগরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর ও প্রধান অতিথি ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল। পাঁচটি দীঘি সমন্বিত এই উপনগরীর নাম ঘোষিত হয় পঞ্চসায়র।

সেতু যখন হয়ে গেল বাড়ি তৈরী সুরু হতে দেরী হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মিদের সমবায় আবাসনের একটা বিশেষ সুবিধাও ছিল। কিছু সর্তসাপেক্ষে এবং সমিতির সুপারিশে প্লটের দলিল পাওয়ার আগেই সরকারী ঋণ পাওয়া যায়। এখন প্রতি ব্লকে শিশুদের খেলার জায়গা সমেত সবশুদ্ধ প্রায় ছয় শ' তিন কাঠা ও চার কাঠার প্লট (অল্প কয়েকটি এর থেকে বড় বা ছোট), উত্তর দক্ষিণে (লম্বায়) নূন্যাধিক তেইশ শ' ফিট ও পূর্ব পশ্চিমে (চওড়ায়) তের শ' ফিট প্রায় চতুষ্কোণ উঁচু জমির ওপর পঞ্চসায়র বিস্তৃত হল। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই সরকারী ঋণ নিয়ে সমিতিদ্বয়ের প্রবর্তিত গৃহনির্মাণ বিধি মত আয়কর সমিতির ষোলটি বাড়ি তৈরী হয়ে গেল। পানীয় জল একশ দেড়শ ফুট গভীরেই টিউওয়েলে পাওয়া গেল। সরকার নির্ধারিত দরে সিমেণ্ট এবং ইঁট পাওয়ায় সেই সময় এই বাড়িগুলি তৈরীর খরচ পড়েছিল গড়ে ৫০ থেকে ৬০ টাকা প্রতি বর্গফুট। এখন যা অকল্পনীয়।

ওই বিশাল মাঠে তখন ষোলটি বাড়ির মধ্যে কয়েকটি পরিবার থাকতে সুরু করলেন। নির্মল বাতাসে দীঘির সান্নিধ্যে দিনে এবং জ্যোৎস্না রাত্রে শহুরে মানুষের কাছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি আনত আর ধূলিহীন আবহাওয়ায় অন্ধকার ছিল স্বচ্ছ। আমরা যারা কলকাতা থেকে প্রায়ই যেতাম, তাদের কাছে সমস্ত জায়গাটা আলো-আঁধারিতে গগন ঠাকুরের ছবির মত মায়াময় মনে হত। কিন্তু কয়েকটি চুরি, ডাকাতির পরে সন্ধ্যার পর জায়গাটা ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল, রাত্রিটা

মনে হত ভূতুড়ে। তবু কেউ ফিরে আসেননি, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলেন—অকুতোভয়।

শুধু তাই নয়, ১৯৭৮ সালে সেপ্টেম্বরের শেষে প্রবল বৃষ্টিতে যখন দু দিন ধরে সহর ও সহরতলীর প্রায় সব রাস্তাই জলে ডোবা, দুদিন বাদে প্রথম বৈকালিক ট্রেনে গড়িয়া স্টেশন পেঁছিবার আগেই ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম চতুর্দিকে জলের মধ্যে আমাদের ভূমিটি রাস্তাঘাটসহ দ্বীপের মত জেগে আছে। এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ এবং অনেকের গৃহেই আশ্রয় পেয়েছে চারপাশের ঘর ডুবে যাওয়া মানুষ, বিশেষ করে আমাদের উপনগরীর পূর্বদিকে শহীদ স্মৃতি কলোনীর কিছু সদ্য আসা ছিন্নমূল পরিবার। তাদের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতের সংযোগে ত্রাণ ব্যবস্থা সুরু হয়ে গিয়েছে, বর্ষা সব ডুবিয়ে দেবার আগের থেকেই। দুটো মৌলিক প্রশ্নের সদুত্তর এই সময় পাওয়া গেল। এক, তখন থেকে পঞ্চাশ বৎসরের অভূতপূর্ব বর্ষায়ও আমাদের ভিত্তিভূমি জলে ডোবেনি—জলস্তরের তিন ফুটের মত উঁচুতে ছিল, অর্থাৎ মাটি ফেলে ভূমির উচ্চতা যথেষ্ট নিরাপদ প্রমাণিত হল। দুই, আমাদের উপনগরীটি প্রতিবেশীদের আশ্রয় এবং আদর্শস্থল হল।

বিদ্যুৎ

এরই সঙ্গে আমাদের প্রচেষ্টা চলছিল CESC থেকে ওই পান্ডব-বর্জিত এলাকায় বিদ্যুৎ আনার। এই ব্যাপারটি আয়কর বিভাগের তদানীন্তন একজন Asstt. Commissioner ও CESC-র Finance Director-এর আনুকূল্যে ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি CESC-র বিদ্যুৎ এসে যায় পঞ্চসায়রে, তিন মাইল দূরের 'মহুয়া' সিনেমার কাছ থেকে মাটির নীচে বাহিত হয়ে। বেশ কয়েকটা বাড়িতে, সেই সঙ্গে রাস্তাগুলোও আলোকিত করার কজে সুরু হয়, জমির দক্ষিণ প্রান্তে একটি ট্রান্সফর্মার বসিয়ে। পঞ্চসায়রে অতদূর থেকে বিদ্যুৎ আনা নিঃসন্দেহে একটা সার্থক প্রয়াস।

বৃক্ষরোপণ

১৯৭৮ সালে যখন পঞ্চসায়রে বাড়ি তৈরী সুরু হয়েছে, তখনও সমস্ত মাঠে একটা খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছ ছিল না। অথচ আমাদের আবাসস্থলে রাস্তা এবং ফাঁকা জমি এত বেশী ছিল যে উপনগরীর পরিকল্পনাতেই জমির নক্সার সঙ্গে একটা Landscape map-ও তৈরী করা হয়েছিল। পরীক্ষামূলকভাবে বাড়ির কাছাকাছি কয়েকটা গাছ লাগানও হয় কিন্তু M. S. Randhawa-র Flowering Trees নামে যে বইটার সাহায্যে ওই map করা হয়েছিল, তাতেই গাছের প্রাথমিক বিপদের কথা বলা আছে—'The protection of young trees in the compound of a house is no great problem. But in public parks and on the roadside it is a serious task. The main enemies of young trees are goats, cattle, monkeys and mischievous boys.' এ কথা যে কত সত্য তা বহু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত, আর পঞ্চসায়রে monkey ছাড়া গাছের এই শত্রুগুলির কোনোটারই অভাব ছিল না। শেষে, সামনের ষাট ফুট চওড়া রাস্তায় ইঁটের gabion করে আর তিনদীঘির ধারে, যথাক্রমে গুলমোহর এবং ক্যাসুরিনা লাগান হল। গুলমোহরগুলি তিন বছরেই পুষ্পিত হল, ক্যাসুরিনাগুলোও কয়েকটা বাদে বেশ জোরাল হয়ে উঠল। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার Social forestry বা সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে দুই আর তিন নম্বর দীঘির মাঝে একটি নার্শারী করেন এবং তৎকালীন বনমন্ত্রী শ্রীপরিমল মিত্র পঞ্চসায়র পরিদর্শন করেন। এইভাবে সরকারী সাহায্যেও বৃক্ষরোপণের কাজ এগোয়।

বৃক্ষরোপণের আগেই দীঘিগুলিতে সোসাইটিদ্বয়ের উদ্যোগে কিছু মাছ ছাড়া হয়। ক্রমশ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেল মোট প্রায় ৪২ বিঘা

দীঘিতে মাছ চাষ করা সোসাইটির পক্ষে সম্ভব নয়, তখন বিভিন্ন সময়ে কয়েকটা দীঘি লিজ দেওয়া হয়।

আমাদের আবাসস্থল সম্পর্কে গোড়া থেকেই আমরা তিনটি সুনির্দিষ্ট বিশেষণ ব্যবহার করতাম যাতে আমরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ থাকি। সে তিনটি হল, self-sufficient, beautiful and sanitary—স্বয়ম্ভর, সুন্দর এবং অনাময়। ১৯৮০ সাল নাগাদ যখন দুটি সোসাইটির সভ্যদের প্রায় শতখানেক বাড়ি নির্মিত এবং নির্মীয়মান তখনই 'পঞ্চসায়র ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংস্থা' গড়ে তোলে একটা পাঠাগার, ক্রীড়া ও বিভিন্ন সময়ে নৃত্যগীত, আবৃত্তি ইত্যাদির অনুষ্ঠান। এরই মধ্যে কিছু কিছু সমসাময়িক সমস্যা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাস নেওয়া ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮০ সালেই পঞ্চসায়র যাদবপুর পুরসভার আওতায় আসে এবং তার চার বৎসর পরে যাদবপুর পুরসভার এলাকা কলকাতা ম্যুনিসিপাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় থেকেই পঞ্চসায়রে 'পঞ্চসায়র সমবায় বিপণি' আর একটি বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা হয় আর ষাটের দশকে প্রকাশিত Calcutta Basic Development Plan নামে কলকাতার প্রথম সার্বিক সমীক্ষায় প্রস্তাবিত উত্তরে দমদম বিমান বন্দরের রাজপথটি Eastern Metropolitan Bye Pass নামে সোজা দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে বাঘাযতীন ষ্টেশন পেরিয়ে পঞ্চসায়রের প্রায় আধ মাইল উত্তরে এসে পশ্চিমে বাঁক নেয়। এই রাস্তাটি পঞ্চসায়র এবং ইতোমধ্যেই নির্মিত অনেকগুলি সমবায় আবাসনের পক্ষে সোজাসুজি সড়কপথে কলকাতার মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এইরকমই একটা যোগাযোগ আমরা চেয়েছিলাম জমি কেনার পরেই ১৯৬৯ সালে বাঘাযতীন রোডের মধ্য দিয়ে, যাতে যাদবপুরের দক্ষিণে সড়কপথে গড়িয়া ষ্টেশন আসতে হলে প্রায় তিন মাইল গড়ে-খাল ঘুরে আসার দুর্ভোগ না পোয়াতে হয়।

বর্তমান

পঞ্চসায়র এখন একটা আদর্শ সমবায়ভিত্তিক উপনগরী। সবশুদ্ধ প্রায় ছ'শ প্লটের মধ্যে বর্তমানে প্রায় তিনশটি প্লটে গৃহ নির্মিত ও নির্মীয়মান, অর্থাৎ ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত গড়ে বৎসরে ২৫টি গৃহ নির্মিত হয়েছে, যেটা আশানুরূপ নয়। তার কারণ, জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে সমিতিদ্বয়ের যথেষ্ট অনুশাসন আছে, এখানে জমি নিয়ে ফাটকা চলে না। তবু আশা করা যায়, গৃহনির্মাণ আরো অধিক সংখ্যক হবে নির্মাণের ব্যয় মাত্রা ছাড়া না হলে।

দ্বিতীয় কথা, পঞ্চসায়র তিনটি ঘোষিত উদ্দেশ্যই সফল করেছে। স্বয়ম্ভরতায়—এর নিজস্ব রেশনের দোকান আছে, গম পেষার চাকি আছে, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর বিপণি আছে, সরকারী দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যুৎ, টেলিফোন ত আছেই, উপনগরীর মধ্যে আবাসী চিকিৎসক ছাড়াও সাধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়, পাঠাগার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংস্থা আছে। অনাময় বা পরিচ্ছন্নতা (sanitation)-র সম্পর্কে প্রথম কথাই হল এর তিন-চার মাইল ব্যাসার্ধে কোনো দূষণজনক কারখানা নেই, রেলের ছন্দিত শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ দূষণ নেই, পয়নালী সবই পাকা, সিমেন্ট করা। সর্বোপরি, রাস্তা, দীঘি, উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, নার্শারী ইত্যাদি নিয়ে আবাস স্থানের অনুপাতে ১৭২% overhead space বা উদ্বৃত্ত প্রসার —এটা বোধ হয়, আর কোথাও নেই। এককথায়, পঞ্চসায়রের মোট প্রায় ২৭২ বিঘার মধ্যে প্লট আছে মাত্র ১০০ বিঘার মত, তারও মধ্যে ছোট playlot ফাঁকা রয়েছে প্রতি ব্লকে। সৌন্দর্যের (beautiful) ব্যাপারে বলতে হয়, এখানে দিগন্ত অবারিত। অধিকাংশ বাড়িই একতলা, প্রত্যেকটিতেই বাগান আছে, প্রধান পথগুলি বৃক্ষ-পুষ্প শোভিত, যদিও আরো বৃক্ষরোপণের স্থান অজস্র।

তৃতীয় কথা, Eastern Metropolitan Bye Pass-এর

সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত হলে পঞ্চসায়র থেকে ব্যস্ত কলকাতার কেন্দ্রে (central business district) আসা যাবে সংক্ষিপ্ত রাস্তায়, যানঘট পেরিয়ে।

ভবিষ্যৎ

পঞ্চসায়রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কলকাতার প্রসারমান দক্ষিণ প্রান্তের কথা। সমগ্রভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং সেই বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান অংশ শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গত কুড়ি বছরে যাদবপুরের দক্ষিণ রেললাইনের পূর্ব দিকে, পঞ্চসায়রের চতুর্দিকের চেহারা একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু সমবায়ভিত্তিক আবাসস্থলগুলিতে একটা পরিকল্পনার চিহ্ন মেলে, কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক যে সব বাসস্থান তৈরী হয়েছে, তা একেবারেই এলোমেলো, উৎক্ষিপ্ত। এর জন্য প্রথমত দায়ী অবশ্য পঞ্চসায়রের তৈরী গড়ে-খালের ওপর পাকা ব্রিজ। এর ফলে যেমন পঞ্চসায়র এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থা পরিকল্পিত আবাসন গড়ে উঠেছে, তেমনি হয়েছে অতি ঊর্ধ্বগামী দরের সময়ে জমির ওপর অত্যধিক চাপ। বলাবাহুল্য, এর ওপর পঞ্চসায়রের কোনো হাত ছিল না, কিছু কিছু সরকারী বিধিনিষেধে হয়ত বা সাময়িকভাবে এটা রুদ্ধ হতে পারে।

এই চাপ থেকে পঞ্চসায়রে আত্মরক্ষার উপায় কি? প্রথম, পঞ্চসায়রের পশ্চিমে টানা রেললাইন, দক্ষিণদিকে গড়ে-খাল, পূর্বদিকে তিনটি বৃহৎ সারিবদ্ধ দীঘি এবং উত্তরে সমবায়ভিত্তিক আবাসন। অর্থাৎ, পঞ্চসায়র বাইরে থেকে জনসংখ্যার চাপের বিরুদ্ধে অনেকটা সুরক্ষিত। দ্বিতীয়, ভিতর থেকে চাপের বিরুদ্ধে রয়েছে পঞ্চসায়রের প্রশাসন ও জমি ব্যবহারের সর্তাবলী। প্লটগুলি লিজ হওয়ায় ভাগ করা যাবে না, নীতিহীন হস্তান্তর হয়ে প্লটের ওপর বহুতল ইমারত উঠবে না এবং সর্বোপরি প্লটের ওপর উদ্বৃত্ত ভূমির অনুপাত ১৭২% এরও বেশী

থাকছে। তৃতীয় সর্তটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা কোনো দেশ, শহর বা জনবিন্যাস সম্পর্কে খাটে। সেটা হচ্ছে পঞ্চসায়রের সমবায়ী আবাসিকরা। কারণ, সমিতিভুক্ত না হলে এখানে কেউ বাসস্থান করতে পারেন না এবং এর আবাসিকের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী, এর সমস্ত পরিবারই উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রায় সমবিত্তের—খুব বড়লোক বা খুব গরিব কেউ নেই। এককথায়, এর আবাসিকরা আর্থ-সামাজিক অর্থে homogenous-সেই কারণে, নির্মাণপর্ব থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত এর একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

পঞ্চসায়রে এই তিন প্রধান সর্ত বর্তমান থাকায় এর ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত এবং শ্রীবৃদ্ধি সম্ভাবিত।

———